একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Technology and Love: Human Crisis in Prachet Gupta's Science Fiction

প্রযুক্তি ও প্রেম: প্রচেত গুপ্তের কল্পবিজ্ঞানে মানবিক সংকট

Name of the Author: **Nilufa Iyasmin**

Affiliation: **Research Scholar, Bengali Department, Burdwan University, West Bengal, India**

Abstract: In Bengali literature, science fiction emerges as a creative confluence of emotion and scientific reasoning. Challenging the assumption that developing societies cannot produce significant science fiction, this discussion highlights that Bengali engagement with scientific imagination dates back to the nineteenth century. From Jagadish Chandra Bose's *Niruddesher Kahini* to the iconic characters of Professor Shonku and Ghanada, Bengali writers have long blended scientific logic with imaginative narrative to create a distinctive literary tradition.

Within this framework, Pracheta Gupta's two stories, *Kotha* and *Krishnachura*, receive particular attention. In Kotha, principles of sound physics and technology expose hidden truths within a marriage; technology remains neutral, yet its revelations prove emotionally devastating. In *Krishnachura*, a female robot becomes the medium through which questions of love and artificial intelligence are explored. While the machine can imitate human behavior, it ultimately fails to embody the fullness of human emotion.

Read together, the stories reveal that technology can both uncover fractures within relationships and expose its own limitations. Gupta does not glorify technology; instead, he foregrounds human vulnerability and emotional complexity. His science fiction thus transcends futuristic spectacle, becoming a profound exploration of the human psyche.

Keywords: Science Fiction, Technology, Love, Humanity, Scientific Consciousness, Marriage, Artificial Intelligence, Surveillance, Modernity, Emotion.

প্রযুক্তি ও প্রেম: প্রচেত গুপ্তের কল্পবিজ্ঞানে মানবিক সংকট

নিলুফা ইয়াসমিন

বাংলাসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান শব্দবন্ধটি উচ্চারণ করলেই যেন দুই ভুবনের সংঘাত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার নরম আলোকছায়া, অন্যদিকে পরীক্ষাগারের কাঁচের শিশিতে জমে থাকা অদৃশ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া। আমরা বাঙালিকে ভাবতে অভ্যস্ত আবেগপ্রবণ, স্মৃতিনির্ভর, অতীতমুখী এক সত্তা হিসেবে। যেন সে বরাবরই পদ্মপাতার জল, অশ্রুর লবণ, কিংবা বিপ্লবের রক্তিম স্বপ্নে নিমগ্ন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই আবেগময় সত্তা কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে অক্ষম? সে কি প্রযুক্তির ভাষা বোঝে না? আজকের দিনে বসে যখন আমরা ফেসবুক- এ লেখালিখি করি, তখন মনে পড়ে একসময় লেখালেখির আগে পেন্সিল কামড়ে ভাবার অবকাশ ছিল। এখন ভাবনাও যেন ডিজিটালকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। চিন্তা আর প্রযুক্তি আলাদা কোনো দ্বীপ নয়। আমরা নিজেরাই তার বড় প্রমাণ। দিব্যি কম্পিউটার চালাচ্ছি, বিশ্বসাহিত্যের সংকলন ঘাঁটছি, মতামত লিখে ফেলছি অনায়াসে। প্রযুক্তি আমাদের গ্রাস করে নি বরং আমরা তাকে ব্যবহার করছি। এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রশ্নটা জোরালো হয়, যে সমাজ প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারে, সে কি কল্পবিজ্ঞান রচনা করতে পারে না?

একটি আন্তর্জাতিক সংকলনের ভূমিকায় চোখে পড়েছিল এক মন্তব্য। বইটির নাম *The World Treasury of Science Fiction,* সম্পাদনায় David G. Hartwell। সেখানে দাবি করা হয়েছে, উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নাকি উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ তারা প্রযুক্তিগত উন্নতির গভীরতা অনুধাবন করেনি। বক্তব্যটি শুধু বিস্ময়কর নয়, গভীর ভাবে সমস্যাজনকও। কারণ এতে একটি পূর্বধারণা কাজ করছে, যে বিজ্ঞান চেতনা কেবল অর্থনৈতিকভাবে উন্নত সমাজের সম্পত্তি। চীন ও জাপানের কল্পবিজ্ঞানের উল্লেখ আন্তর্জাতিক সংকলনে স্থান পায়, কিন্তু ভারতের নামও অনুল্লেখিত থাকে আর বাংলা ভাষার তো প্রশ্নই ওঠে না। যেন এই ভূখণ্ডের সাহিত্যকে বলা যায় লোককথা আর আধ্যাত্মিকতার ভাঁড়ার। অথচ বাংলাভাষায় কল্পবিজ্ঞানের চর্চা উনিশ শতক থেকেই শুরু। বৈজ্ঞানিক তথ্য, ভিনগ্রহের অভিযান, সময় ভ্রমণ, অদ্ভুত আবিষ্কার, সবই এখানে এসেছে নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজস্ব সামাজিক প্রেক্ষাপটে। ভাবতে বসলে কল্পবিজ্ঞান কাহিনির সংজ্ঞাটা খুব জটিল বলে মনে হয় না। শব্দটির মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে- কল্পনা আর বিজ্ঞান। অর্থাৎ যেখানে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা তত্ত্বকাহিনির ভিত গড়ে দেয়, আর তার ওপর দাঁড়িয়ে কল্পনা ডানা মেলে, সেখানেই কল্পবিজ্ঞান। নিছক রূপকথা নয়, আবার শুষ্ক গবেষণাপত্রও নয়। বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে ভিত্তি করে গল্পের অগ্রসর হওয়াই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিছু গবেষকদের মতে, বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ কল্পনা করাই কল্পবিজ্ঞানের মূলকাজ। আজ যা পরীক্ষাগারে, কাল তা মানবজীবনের অংশ। এই সম্ভাবনার পথ ধরেই গল্প এগোয়। আবার অন্য মত বলছে, ভবিষ্যৎ উচ্চারণ করাটাই আসল, মানুষের অজানা গ্রহের প্রতি কৌতূহল, অনাবিষ্কৃত রোগের প্রতিষেধকের স্বপ্ন, প্রযুক্তির অচেনা বিস্ময়। এসব আকাঙ্ক্ষাই কল্পবিজ্ঞানের প্রাণ।

বাংলাসাহিত্যে প্রথম সাইন্সফিকশন লিখেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ***নিরুদ্দেশেরকাহিনী***। পরে গল্পটি ***পলাতক তুফান*** নামে ***অব্যক্ত*** সংকলনে পুনরায় প্রকাশিত হয়। পরে ইংরেজিতেও অনুবাদ করা হয়। এই গল্পে সমুদ্রের ওপর তেল ছড়িয়ে জলের পৃষ্ঠটান বদলে ঢেউ কমানোর বৈজ্ঞানিক সত্যকে ব্যবহার করে সামুদ্রিক ঝড় থামানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাত্ত্বিক আলোচনা নেই, বিজ্ঞান নিঃশব্দে কাহিনির ভেতর মিশে গিয়ে গল্পটিকে করে তুলেছে সুন্দর ও নিটোল। এছাড়াও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেছেন –শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনারাণ ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হুমায়ূন আহমেদ, মোস্তফা কামাল প্রমুখ লেখকেরা। প্রফেসর শঙ্কু, ঘনাদা, বিশ্ব মামা, নাট বল্টু, ড. বসু প্রমুখ চরিত্রগুলির মাধ্যমে লেখকেরা সাইন্সফিকশনের এক আলাদা জগত তৈরি করেছেন। এই চরিত্ররা কেবল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি বলেন না, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, রসবোধ ও দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে জীবন্ত করে তোলেন। কখনো যুক্তিবাদী মনন, কখনো রহস্য ও রোমাঞ্চ, আবার কখনো কৌতুকের আবরণে বিজ্ঞান নতুন রূপে ধরা দেয়। ফলে পাঠক কেবল তথ্য নয়, কল্পনা ও বিস্ময়ের এক স্বতন্ত্র সাহিত্য ভুবনের স্বাদ পান।

এবার আসব এ কালের লেখক প্রচেত গুপ্তের কথায়। তাঁর গল্পে ভয়, ভালোবাসা, নারী মনস্তত্ত্ব – সবই আমরা পেয়েছি । তবে তাঁর সায়েন্স-ফিকশনে আমরা পাই একটা নতুন স্বাদ যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। লেখক গুপ্ত প্রযুক্তিকে অলৌকিক চমক হিসেবে দেখেন না, আবার অন্ধ প্রত্যাখ্যানও করেন না। তার বদলে মানুষের ভেতরকার শূন্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও বিভ্রমকে বিজ্ঞানের আলোয় প্রতিফলিত করেন। তাঁর গল্পে প্রেম কেবল আবেগের উচ্ছ্বাসেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে ওঠে বিশ্লেষণের উপাদান, পরীক্ষাগারের বিষয়, কখনও বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমানির্ণয়ের ক্ষেত্র। ফলে তাঁর রচনায় ল্যাবরেটরি ও বসন্তের কৃষ্ণচূড়া একই ন্যারেটিভবৃত্তে এসে মিলিত হয়। এমনই দুটি গল্প এই গবেষণার উপস্থাপনা। একটি হল – ***কথা*** এবং অপরটি হল ***কৃষ্ণচূড়া।*** এই দুই গল্পে রয়েছে গদগদ প্রেম আবার প্রযুক্তির হাত ধরে প্রেমে প্রতারণা।

কথা গল্পটি এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক যোগাযোগ-সভ্যতার এক তীক্ষ্ণ প্রতিচ্ছবি। এখানে পদার্থবিজ্ঞানের শব্দতত্ত্ব কেবল প্রেক্ষাপট নয়, তা কাহিনির অন্তর্গত দার্শনিক কাঠামো নির্মাণ করে। শব্দ পদার্থবিজ্ঞানে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, যা বায়ুমাধ্যমে সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। একাধিক তরঙ্গ মিলিত হলে ইন্টারফেরেন্স ঘটে। কখনও পরস্পরকে জোরদার করে, কখনও নিঃশেষ করে। গল্পে প্রফেসর সোহম তালুকদারের কল্পিত কথার জট এই বৈজ্ঞানিক নীতির সাহিত্যিক রূপান্তর। বাতাসে ভেসে থাকা অসংখ্য বাক্য, অর্ধেক উচ্চারিত স্বীকারোক্তি, গোপন আলাপ- সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অদৃশ্য জটিলতা, যেখানে অর্থ বিকৃত হয়, গোপনীয়তা ভেঙে যায় এবং সত্য অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধরা পড়ে।

অর্ক, এই কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র, যিনি একজন বিজ্ঞানী। তার ল্যাবরেটরি অপারেশন থিয়েটারের মতো সজ্জিত- রবারের গ্লাভস, মুখোশ, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। শব্দ যেন শল্যচিকিৎসার উপাদান, আর বিজ্ঞানী তার সার্জন। গল্পের সূচনায় আমরা দেখি ছাব্বিশ বছরের যুবক অর্কর বুকের বাঁদিকে আকস্মিক কম্পন। প্রথমে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন – একি হৃদরোগের পূর্বলক্ষণ? কিন্তু শীঘ্রই তা স্পষ্ট হয়, এই কম্পনের কারণ

শারীরিক অসুস্থতা নয়, বরং স্ত্রীর ফোনকল।*এই সময় কেঁপে ওঠার অর্থ উৎসা তাকে ফোন করছে। এটাই তার স্বভাব। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ঘনঘন ফোন করে। মনে হয়, বড়ধরনের কোন বিপদে পড়েছে।*[১] এই উৎসা তার স্ত্রী। অর্ক বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় উৎসাকে পইপই করে বলে এসেছিল, *আমাকে ফোন করবে না, উৎসা।*[২] সদ্য বিবাহিতা উৎসা স্বামীকে ছাড়া থাকতে পারে না, ভালোবাসার অস্থিরতায় সে বারবার ফোন করে। এদিকে অর্ক মুখে আপত্তি জানালেও অন্তরে সে এই আদরমাখা খুনসুটি উপভোগ করে। প্রেম এখানে একটি পারস্পরিক নির্ভরতার জায়গা তৈরি করে, যেখানে অনুপস্থিতিও উপস্থিতির মতোই তীব্র।

একদিন অফিসে যাওয়ার সময় উৎসাকে অর্ক ফোন করতে বারণ করলে উৎসা রসিকতা করে বলে ওঠে, *ফ্লাটে একা থাকি। দুপুরে যদি দস্যু আসে? এসে আমাকে মুখ বেঁধে... হি হি। তা হলেও ফোন করব না?*[৩]- এই বাক্যটি গল্পের ভবিষ্যৎ ট্র্যাজেডির এক অন্তর্লীন ইঙ্গিত। তখন তা নিছক রসিকতা। কিন্তু সাহিত্যের অন্তর্গত গঠনপ্রক্রিয়ায় এই উক্তি একটি পূর্বাভাসের ভূমিকা পালন করে। দুপুরে উৎসা আবার ফোন করে এবং অর্ক সেই ফোন ধরে। তার মনে পড়ে যায় উৎসার সেই কাল্পনিক দস্যু-র কথা। দুজনের আলাপচারিতায় আমরা দেখি স্বাভাবিক দাম্পত্যস্নেহ, একান্ত ব্যক্তিগত উষ্ণতা। অর্ক জানায়, সে এখন ল্যাবে কথার জট ছাড়াচ্ছে, অর্থাৎ প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের কথোপকথনের স্তরকে ভিন্ন করছে। এখানেই গল্পের মূল দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত।

প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্ক তার ল্যাবে অসংখ্য মানুষের কথোপকথন শুনতে পারে, শব্দের স্তর আলাদা করতে পারে। ভাষা এখানে আর ব্যক্তিগত নয়, তা হয়ে ওঠে তথ্য, ডেটা, বিশ্লেষণের উপাদান। কিন্তু প্রযুক্তির এই নিরপেক্ষ ক্ষমতা একসময় তার ব্যক্তিগত জীবনে আঘাত হানে। জট ছাড়াতে ছাড়াতে সে হঠাৎ শুনতে পায় উৎসার গলা- চিরপরিচিত সেই আদরমাখা স্বর। প্রথমে তা বিস্ময়, তারপর ধীরে ধীরে আতঙ্কে পরিণত হয়। উৎসা অন্য কাউকে ফোন করে বলছে, *কখন আসবে? না না একটা নয়, দুটো... লাঞ্চের পর আমি ন্যাপ নিই জানোনা?... দূর বোকা, ও তখন কোথায়?... ল্যাবরেটরিতে...হিহি... দস্যুএকটা... ফাঁকা ফ্লাটে এসে যদি আমার মুখ বেঁধেছো... হিহি...।*[৪] যে শব্দ একদিন রসিকতার ছলে উচ্চারিত হয়েছিল, আজ তা বিশ্বাসঘাতকতার সংকেত হয়ে ফিরে আসে। এই মুহূর্তে প্রযুক্তি এক নির্মম সত্য উন্মোচন করে। অর্ক যে যন্ত্রের সাহায্যে স্ত্রীকে স্নেহময়ী কণ্ঠে শুনে আশ্বস্ত হতো, সেই যন্ত্রই তাকে জানিয়ে দেয় উৎসার পরকীয়ার বাস্তবতা। প্রেম ও প্রযুক্তির এই দ্বৈত সম্পর্ক গল্পটিকে গভীর তাৎপর্য প্রদান করে। প্রযুক্তি নিজে নিরপেক্ষ, সে কেবল তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু সেই তথ্য যখন ব্যক্তিগত আবেগের কেন্দ্রে আঘাত করে, তখন তা নির্মম হয়ে ওঠে। অর্ক বারবার সেই রেকর্ড শোনে, যা তার মানসিক ভাঙনের প্রতীক। পায়ের তলা থেকে তার মাটি সরে যায় কারণ যে বিশ্বাসের উপর তার দাম্পত্য দাঁড়িয়েছিল, তা মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।

গবেষণামূলক দৃষ্টিতে গল্পটি আধুনিকতার এক সংকটকে চিহ্নিত করে। প্রযুক্তি মানুষের যোগাযোগকে সহজ করেছে, কিন্তু একইসঙ্গে ব্যক্তিগত পরিসরকে স্বচ্ছ করে তুলেছে। গোপনীয়তা ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। অর্কর ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপায় নয়, তা তার জীবনের অন্তরঙ্গ সত্যের অনাবৃতকারী। এখানে প্রশ্ন ওঠে- প্রযুক্তি কি সম্পর্ককে শক্তিশালী করে, নাকি দুর্বলতার উন্মোচন ঘটায়? উৎসা

যখন অর্ককে ভালোবেসে ফোন করে, তখন প্রযুক্তি তাদের সান্নিধ্যের মাধ্যম। কিন্তু সেই একই প্রযুক্তি তার বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষী। প্রেমের প্রকৃতি এখানে দ্ব্যর্থক। উৎসা কি সত্যিই ভালোবাসত না? নাকি ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা একাধিক স্তরে বিভক্ত? গল্পটি সরল নৈতিক সিদ্ধান্ত দেয় না। এখানে আমরা দেখতে পাই, মানব-মন জটিল। অর্ক ও উৎসার সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ, খুনসুটি, নির্ভরতা- সবই ছিল। তবু তার অন্তরালে আরেকটি গোপন সম্পর্ক চলছিল। এই দ্বৈততা আধুনিক নাগরিকজীবনের এক বাস্তবচিত্র। মানুষ একইসঙ্গে একাধিক ভূমিকা পালন করে, একাধিক আকাঙ্ক্ষায় বিভক্ত থাকে। প্রযুক্তি সেই বিভাজনকে দৃশ্যমান করে তোলে।

অতএব ***কথা*** গল্পটি আধুনিক দাম্পত্য, প্রযুক্তি ও বিশ্বাসের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলে। প্রেম কি কেবল অনুভূতির বিনিময়, না কি তা বিশ্বাসের উপর নির্মিত একটি নৈতিক কাঠামো? প্রযুক্তি কি নিরপেক্ষ সাক্ষী, না কি সম্পর্কের অন্তরঙ্গতাকে ভেঙে দেওয়ার শক্তি? অর্ক ও উৎসার কাহিনি এই প্রশ্নগুলিকে তীব্র করে তোলে। এখানে বিজ্ঞান ও প্রেম মুখোমুখি দাঁড়ায়- একটি সত্য উন্মোচন করে, অন্যটি সেই সত্যে আহত হয়। গল্পের মর্মবস্তু এই যে, আধুনিক সময়ে প্রযুক্তি আমাদের ভালোবাসাকে যেমন দৃঢ় করতে পারে, তেমনি তার অন্তর্গত ফাটলও নির্মমভাবে প্রকাশ করতে পারে। আর সেই প্রকাশের অভিঘাতই মানুষের ভেতরের সবচেয়ে নীরব কম্পনকে শ্রুতিযোগ্য করে তোলে। এখানে লেখক কল্পবিজ্ঞানের আশ্রয়ে তৎকালীন বাস্তবজগতকেই গভীরভাবে প্রতিফলিত করেছেন। কোনো অলীক ফ্যান্টাসি নেই, নেই দূর গ্রহ থেকে উড়ে আসা এলিয়েনের চমক। আছে ভবিষ্যতের এক সম্ভাব্য চিত্র, যার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ, বিজ্ঞানচেতনা ও মানবিক সংকট অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও শিল্পিত ভঙ্গিতে উন্মোচিত হয়েছে। কল্পনা এখানে বাস্তবকে আড়াল না করে বরং তাকে আরও তীক্ষ্ণভাবে দৃশ্যমান করেছে।

এই নির্মাণ বিশ্বসাহিত্যের নানা রচনার সঙ্গে ভাবগত সংলাপে প্রবেশ করে। George Orwell-এর ***Nineteen Eighty-Four***-এ রাষ্ট্র টেলিস্ক্রিনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শব্দনিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে নজরদারির ছায়ায় আবদ্ধ। ***কথা*** গল্পেও কর্পোরেট গবেষণা বাতাসে ভেসে থাকা বাক্য ধরে ফেলে- এখানেও গোপনীয়তা অনিশ্চিত। আবার Don DeLillo-র ***White Noise*** আধুনিক জীবনের অবিরাম শব্দকে অস্তিত্ব সংকটের প্রতীক করেছে। প্রচেত গুপ্ত সেই নয়েজ-সংকটকে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ভেতর প্রতিস্থাপন করেন। তাঁর ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নৈতিক দর্শনে রূপান্তরিত হয়, ইন্টারফেরেন্স এখানে তরঙ্গের নয়, সম্পর্কেরও। প্রযুক্তি এই গল্পে বিভ্রম সরিয়ে দেয়। বিজ্ঞান এখানে আয়না- যেখানে প্রতিফলিত হয় সম্পর্কের গোপন ফাটল।

এবার ***কৃষ্ণচূড়া*** গল্পে প্রবেশ করলে ভিন্ন এক প্রযুক্তি-পরিসর দেখা যায়। এখানে রোবোটিক্স ইনস্টিটিউট, সেন্সর, চিপস, অ্যাকচুয়েটর, হাইড্রোলিকসিস্টেম-সব মিলিয়ে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার পরিমণ্ডল। ডিরেক্টর মণিময় সামন্তের 'জেডএমপিটেকনিক' রোবটের চলন নিয়ন্ত্রণ করে। রোবট হাঁটে, লাফায়, এমন কি হাই তোলে। অর্থাৎ মানুষের শরীরী অঙ্গভঙ্গির নিখুঁত অনুকরণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অনুকরণ কি সমার্থক? মানুষের হাইতোলার সঙ্গে জড়িত ক্লান্তি, মানসিক একঘেয়েমি, কখনও অপ্রকাশিত বিরক্তি। রোবটের ক্ষেত্রে তা প্রোগ্রামড সংকেতমাত্র। এই সূক্ষ্ম ফারাকই কাহিনির কেন্দ্রীয় টানাপোড়েন।

কেসিক্স বা*কৃষ্ণচূড়া* মডেল তৈরি হয়েছে সঙ্গী হিসেবে- আধুনিক নিঃসঙ্গতার প্রযুক্তিগত সমাধান। নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা পূরণে যন্ত্রের সহায়তা।*.... বললেনড. সরকার, কেসিক্স শুধু ভালো মডেলই হয়নি, তার অ্যাপিয়ারেন্সও চমৎকার হয়েছে। শাড়ি পরিয়ে টিপিক্যাল বাঙালি অল্পবয়সী মেয়ের ইম্প্রেশন দেওয়া হয়েছে। ড. মিত্র মডেলের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে গয়না পর্যন্ত আনিয়েছেন। হাইড্রোলিক সিস্টেম এমনভাবে প্রোগ্রাম করেছেন যাতে মেয়েটা নির্দিষ্ট ইন্টারভেলে কপালের উপর পড়া চুল ঠিক করতে পারে। রোবট বলে মনেই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সত্যিকারের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে।*[৫] সে কথা বলতে পারে, গল্পগুজব করতে পারে, এমনকি কপালের উপর পড়া চুল সরানোর ভঙ্গিও পুনরাবৃত্তি করে। এই চুল সরানো মোটিফটি গভীর প্রতীকী। এটি মানবিক আকর্ষণের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, যা সিঞ্চনের মধ্যে প্রেম ও কামনার সাড়া জাগায়। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার কাছে তা অ্যালগরিদমিক ফাংশন। ভাষা তাকে দেওয়া হয়েছে, শরীরের ভাষা নয়– এই উক্তি প্রযুক্তির সীমা নির্ধারণ করে।

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি, ল্যাবরেটরির নিখুঁত, নির্বীজ পরিবেশ ছেড়ে একদিন হঠাৎ রোবট কৃষ্ণচূড়া বাইরে বেরিয়ে পড়ে। সে যেন নিজস্ব কোনো অদৃশ্য টানে শহরের ভিড়ে মিশে যেতে চায়। তার এই বেরিয়ে আসা নিছক একটি যান্ত্রিক ত্রুটি নয়, বরং কৌতূহলের মতো দেখতে একটি প্রোগ্রামড আকাঙ্ক্ষা। প্রথমদিনই ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে তার দেখা হয় সিঞ্চনের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎ ঘটনাচক্রে হলেও, লেখক সেটিকে এমনভাবে নির্মাণ করেন যেন দুই ভিন্নজগতের মিলন ঘটছে- একদিকে রক্তমাংসের মানুষ, অন্য দিকে ধাতবশরীরে আবদ্ধ কৃত্রিম চেতনা। সিঞ্চন প্রথমে কৃষ্ণচূড়াকে একজন অদ্ভুত, সংযত, খানিক অন্যমনস্ক মেয়ে হিসেবেই দেখে। ট্যাক্সি থেকে নামার সময় সিঞ্চন দেখে কৃষ্ণচূড়ার সৌন্দর্য আছে, রহস্য আছে, কিন্তু যন্ত্রসত্তা নেই। এরপরই ধীরে ধীরে তাদের প্রেম হয়। কৃষ্ণচূড়া খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলত- *মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না, আমার সেন্সরগুলো খুব পাওয়ারফুল।*[৫] অথবা কখনো বলত-*আমি পাজল ভাঙ্গতেও পারি।*[৬] কিন্তু সিঞ্চন এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিত। তার মনে হতো, এতো নিছক রসিকতা। আধুনিক মেয়েদের একটু অভিনব ভঙ্গি। সে ভাবতেই পারেনি, কৃষ্ণচূড়া আসলে সত্যিই সীমাবদ্ধ। তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি প্রতিক্রিয়া পূর্বনির্ধারিত কোডে বাঁধা।

এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক গভীর হয়। তিনমাস সময় লাগে না, শহরের কোলাহলের মধ্যে, ক্যাফের টেবিলে, ট্যাক্সির ভেতর, পার্কের বেঞ্চে – তাদের কথাবার্তা, হাসি, দৃষ্টিবিনিময়ে তৈরি হয় এক ঘনিষ্ঠতা। সিঞ্চনের কাছে কৃষ্ণচূড়া ক্রমে হয়ে ওঠে এক অপরিহার্য উপস্থিতি। লেখক এখানে তিনমাস পরের একটি দৃশ্য নির্মাণ করেন-যা গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেদিন সিঞ্চন কৃষ্ণচূড়াকে একান্তে পেয়ে, তাকে শারীরিকভাবে কাছে পেতে চায়। তার দৃষ্টিতে এটি প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি, ভালোবাসার স্পর্শ, আলিঙ্গনের উষ্ণতা। *এরপর আর সিঞ্চন নিজেকে সামলাতে পারে না। সে এগিয়ে এসে কৃষ্ণচূড়ার দুটো গাল দু'হাতে আলতো করে ধরে। ঠোঁট নামিয়ে দেয় মুখের উপর। কৃষ্ণচূড়া ক্রমশ সরে যেতে চেষ্টা করে। পারে না, সিঞ্চন তার ঠোঁট ঘষতে থাকে কৃষ্ণচূড়ার চোখের পাতায়, কপালে, কানের লতিতে। কৃষ্ণচূড়া বাধা দিতে থাকে। মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বের হয়। হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে সিঞ্চনের মুখ। তৎক্ষণে সিঞ্চন তার*

বুকের উপর একটা হাত নামিয়ে এনেছে। আঙুলগুলো নড়তে থাকে গভীর আদরে। সরে যেতে গিয়ে জানলার গ্রিলে কৃষ্ণচূড়ার মাথা ঠুকে যায়। কৃষ্ণচূড়া মুখ ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। সিঞ্চন তার ঠোঁট রাখতে চেষ্টা করে কৃষ্ণচূড়ার ঠোঁটে। কখনও পারে, কখনও পারেনা। একটি হাত ঘাড়ের পিছনে ধরে অন্যহাতে কৃষ্ণচূড়ার টপের বোতাম খুলতে থাকে পাগলের মতো। গাঢ় গলায় ফিসফিস করে বলতে থাকে, 'কৃষ্ণচূড়া, আমার কৃষ্ণচূড়া...'[৮] কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। কৃষ্ণচূড়া হঠাৎ কঠোর হয়ে যায়। তার চোখের কোমল আলো নিভে গিয়ে সেখানে যেন জ্বলে ওঠে সতর্কসংকেত। সিঞ্চনের হাতএগোতেই সে তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়।

এই ধাক্কা কেবল শারীরিক নয় – এটি মানুষের আবেগের ওপর যন্ত্রের সীমার এক নির্মম ঘোষণা। এরপর একদিন কৃষ্ণচূড়া শান্ত, নিরাবেগ কণ্ঠে জানিয়ে দেয়-*সরি সিঞ্চন। আমি অনেক পাজল ভাঙতে পারি, কিন্তু সবটা পারি না। আমাকে ভুলে যাও।..... না পারি না। যে ক্ষমতা আমার নেই, আমাকে দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে ভাবতে পারি না।*[৯] তার প্রোগ্রামে এই ঘনিষ্ঠতার অনুমতি নেই। তাকে যে ভাষা, যে আচরণ, যে অনুভূতির অনুকরণ শেখানো হয়েছে, তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। প্রেমের কথা বলা যায়, হাত ধরা যায়, হাসি বিনিময় করা যায়–কিন্তু শরীরের গভীরে প্রবেশের অনুমতি তার সফটওয়্যারে লেখা নেই। কৃষ্ণচূড়া যে রোবট তা সিঞ্চনের কাছে অজানায়ই রেখেছেন লেখক। লেখক আর জানাননি সিঞ্চনের পরবর্তী পরিস্থিতির কথা। ফলে গল্পটি কেবল এক অসম প্রেমের আখ্যান হয়ে থাকে না। এটি হয়ে ওঠে আধুনিক সময়ের এক গভীর প্রশ্ন- যন্ত্র কি অনুভব করতে পারে? আর যদি পারে, তবে সেই অনুভব কি শরীরের উষ্ণতা পর্যন্ত পৌঁছায়, নাকি কোডের সীমানাতেই থেমে যায়? কৃষ্ণচূড়ার সেই এক ধাক্কা পাঠকের মনেও যেন প্রশ্নের ঝড় তোলে – প্রেম কি কেবল আবেগ, না কি তারও একটি নির্ধারিত সফটওয়্যার আছে?

কৃষ্ণচূড়ার পালিয়ে যাওয়া আসলে আত্মসন্ধান। প্রযুক্তি বাজারজাত পণ্য – বিদেশি অতিথি, প্রদর্শনী, অর্ডার- সবই বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট নির্দেশ করে। কিন্তু প্রেমের অভিজ্ঞতা তাকে প্রদর্শনীর বস্তু থেকে অস্তিত্ব সংকটের চরিত্রে রূপান্তরিত করে। শেষপর্যন্ত তাকে গেটের কাছে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পাওয়া যায়। ইন-বিল্ট চার্জ ফুরিয়ে গেছে। এটি কেবল যান্ত্রিক ক্লান্তিকে পেছনে ফেলে প্রেমের পরীক্ষায় নিঃশেষ হওয়ার রূপক। মানুষের আবেগ যেমন শক্তিক্ষয় করে, তেমনি যন্ত্রের চার্জও ফুরোয়, তবে কারণ ভিন্ন। এই গল্পে প্রযুক্তি মানুষের প্রতিরূপ নির্মাণে সক্ষম, কিন্তু মানব-অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতা ধারণে অক্ষম। প্রেমশরীর-মন-ভাষার সম্মিলিত সঞ্চার। অ্যালগরিদম তার সম্পূর্ণতা স্পর্শ করতে পারে না। কৃষ্ণচূড়া তাই অসম্পূর্ণতার প্রতীক, আর তার নিঃশেষ শক্তি আধুনিক প্রযুক্তি-সভ্যতার অন্তর্গত শূন্যতার ইঙ্গিত।

দুটি গল্প পাশাপাশি পাঠ করলে এক জটিল মিল-অমিলের মানচিত্র উন্মোচিত হয়। উভয়ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি কেন্দ্রীয় শক্তি – একটিতে শব্দতত্ত্ব, অন্যটিতে রোবোটিক্স। একটিতে সত্য উদ্ঘাটন ধ্বংস ডেকে আনে, অন্যটিতে সত্যের অনুপস্থিতি প্রেমকে অসম্পূর্ণ করে। অর্ক প্রযুক্তির সহায়তায় সম্পর্কের গোপন দিক আবিষ্কার করে। সিঞ্চন প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতায় প্রেমের অপূর্ণতা অনুভব করে। ***কথা*** গল্পে প্রযুক্তি মানুষের অজানা দিক

উন্মোচন করে।*কৃষ্ণচূড়া*-তে প্রযুক্তি মানুষের মতো হতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। প্রথমটি নজরদারি ও ডেটা-যুগের সংকট। দ্বিতীয়টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবেগ-অক্ষমতারপ্রশ্ন।

তবু মিল আছে –দু' ক্ষেত্রেই প্রেম অনিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা কিংবা যান্ত্রিক নিখুঁততা তাকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। *কথা*-তে ইন্টারফেরেন্স সম্পর্ককে ক্ষীণ করে, অন্যটিতে প্রোগ্রামিংয়ের সীমা প্রেমকে অসম্পূর্ণ রাখে। একটিতে শব্দের অতিরিক্ততা, অন্যটিতে স্পর্শের অভাব। আধুনিক জীবনে আমরা যেমন বার্তার ভিড়ে ডুবে থাকি, তেমনি প্রযুক্তিনির্ভর সংযোগের মাঝেও আবেগের শূন্যতা অনুভব করি – এই দ্বৈত বাস্তবতা দুই আখ্যানকে যুক্ত করে।

এখানেই প্রচেত গুপ্ত তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকথিত কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে যেখানে বিস্ময়, প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎ কল্পনার জৌলুস প্রাধান্য পায়, সেখানে তাঁর লেখনী এক ভিন্ন দিশা নির্দেশ করে। তিনি প্রযুক্তিকে কাহিনির কেন্দ্রে স্থাপন করেও তাকে সর্বশক্তিমান করে তোলেননা, মানুষের অনুভূতি, সম্পর্ক, দুর্বলতা ও ভালোবাসাকেই মুখ্য করে তোলেন। তাঁর আখ্যানের ভেতরে যন্ত্র উপস্থিত থাকে, কিন্তু তার চেয়েও গভীর ও স্থায়ী হয়ে ওঠে মানবিক স্পন্দন। এইকারণেই তাঁর কল্পবিজ্ঞান নিছক ভবিষ্যৎ চিত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে ওঠে মানবমনের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান। প্রযুক্তি এখানে প্রেক্ষাপট, মানুষই প্রকৃত বিষয়। শেষপর্যন্ত স্পষ্ট হয় – সমস্ত অ্যালগরিদম, সফটওয়্যার ও যান্ত্রিক দক্ষতার ঊর্ধ্বে মানবিকতাই একমাত্র চূড়ান্ত শক্তি, তার কাছেই প্রযুক্তির নীরব আত্মসমর্পণ।

তথ্যসূত্র:

১.গুপ্ত, প্রচেত; *পঞ্চাশটিগল্প*; আনন্দপাবলিশার্স; কলকাতা; প্রথমসংস্করণ; ২০১০; পৃষ্ঠা - ৭০
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৫
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৪
৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৮
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা -২৮১